Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.55-62
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আসামের টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত

ড. নীতিশ দাস
সহকারী অধ্যাপক, মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়, মার্ঘেরিটা, তিনিসুকীয়া, আসাম

Abstract

The Tai Khamyang of Assam is one of the sub groups of larger Tai people of South East Asia. The Tai groups of people are scattered in mostly China, Thailand, Myanmar and in Assam and Arunachal Pradesh of North East India also. Tai Khamyangs have been migrated to this region from their ancient homeland during 13th century after crossing the Patkai Hill range. In Assam they are mostly found in Jorhat, Sibsagar, Golaghat and Tinsukia district. They belong to Mongoloid racial group and linguistically they are included in Shyam – Chine or Thai-Chine. They follow patrilineal descent and the followers of Buddhism.

Key words: Tai Khamyang, Migration, Mongolid Races, Tinsukia, Buddhism.

ভূমিকা : আসামের টাই খাময়াং লোকেরা বৃহত্তর টাই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্যতম বর্ণাঢ্য জনগোষ্ঠী। সেজন্য টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর আসামে প্রব্রজনের ইতিহাস বৃহৎ টাই গোষ্ঠীর মূল বাসভূমি এবং প্রব্রজনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষকরে চীন, থাইলেণ্ড, ম্যায়ানমার এবং উত্তরপূর্ব ভারতে ছড়িয়ে আছে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় টাই সকল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তারা শ্যাম-চীন বা থাই-চীন শাখার অন্তর্গত।

টাই জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের ইতিহাস প্রব্রজনের ইতিহাস। মূলত চীন দেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রব্রজন ঘটা টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আসামে প্রবেশ করার সূত্রপাত ঘটলেও আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের পর তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আসামে প্রব্রজন করা টাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বপ্রথম আহোমরা ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে পাটকাই গিরিপথে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে টাই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত –টাই খামতি, টাই ফাকে, টাই খাময়াং, টাই টুরুং এবং টাই আইতন লোকেরা উত্তরপূর্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।

আসামে বসবাস করা টাই খাময়াং সকল বৃহত্তর টাই জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি দল। আসামে বসতি স্থাপনের পূর্বে তারা খামজাং অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে কিন্তু সেখানে চিংফৌ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সংঘাতের সূত্রপাত হয় এবং খাময়াং লোকেরা সে অঞ্চল ত্যাগ করে আসামে প্রব্রজন করে। বর্তমান সময়ে

তারা আসামের শিবসাগর, যোরহাট, গোলাঘাট এবং তিনিসুকীয়া জেলায় বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচয় : টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেদের খাময়াং বলে অভিহিত করলেও সাধারণত তাদের নরা নামে জানা যায়। তখনকার সময়ে আসামের স্থানীয় জনসাধারণ তাদের নরা নামেই সম্বোধন করতেন। কিন্তু টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের খাময়াং বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। নরা বলতে আহোম মৌঙ্ কঙ্ এবং ব্রাহ্মী বা মান শব্দ মোগঙ্ বা মোগাউঙ্ দেশকে বুঝায়। মূলতঃ নঙ্ রাই শব্দ থেকেই নরা শব্দের উৎপত্তি। নঙ্ মানে হ্রদ বা বিল এবং রাই মানে প্রজ্বলিত থাকা। প্রকৃতপক্ষে নঙ্ রাই মানে হল জলাতক অঞ্চল বা দেশ। সে দেশে জলপ্রকোপের মধ্যে থেকেও তারা ধান চাষ করে জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছে। ত্তাই খাময়াং ইতিহাস মতে, নরা শব্দটি আহোম ভাষার না-লা (জলাদৃত ভূমি) শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা নঙ্ খেউ নঙ্ নক্ জাঙ্ত বসতি স্থাপন করার সময়ে দুটি অঞ্চলেই গ্রাম পেতে বসতি স্থাপন করেছিল। একটি গ্রাম ছিল পার্বত্য অঞ্চলে এবং অন্যটি ছিল জলাভূমি অঞ্চলে। পার্বত্য গ্রামটি মান্ নয় (মান্-গ্রাম, নয়-পর্বত) অর্থাৎ পার্বত্য গ্রাম এবং জলাভূমি অঞ্চলের তীরবর্তী গ্রামকে মান্ নাম্ (মান্-গ্রাম, এবং নাম্-জল) অর্থাৎ জলের পাশ্ববর্তী গ্রাম নামে পরিচিত হয়েছিল। নঙ্ খেউ নঙ্ নকজাঙ্ অঞ্চলটি উজান আসামের পাটকাইর পাশ্ববর্তী পুরাতন মৌঙ্ কঙ্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নঙ্ খেউ শব্দের অর্থ হল নীল জলের হ্রদ (নঙ্-বিল বা হ্রদ, খেঙ-নীল) এবং নঙ্ নক জাঙ্ মানে বকের সমাগম থাকা বিল (নঙ্-বিল, নকজাঙ্-বকপাখি)। নয়টি পর্বতের সংগমস্থলে অবস্থিত নঙ্ খেউ হ্রদের জল প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি হওয়া জলাভূমি অঞ্চলে বছরের সবসময় অসংখ্য বকের ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য এই অঞ্চলকে বক থাকা বিল বলে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলকে Lake of no return নামে জানা যায়।

খাময়াং জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোককথা অনুসারে তাদের পূর্বপুরুষের এক রাজার তিন পৌত্র ছিল। তারা বড় হয়ে প্রত্যেকেই রাজার কাছে নিজস্ব ভূখণ্ডের দাবী করে। তখন রাজা জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে একটি ঢোল দিয়ে বলেন যে এই ঢোলটি নিয়ে যাত্রা করার সময় যে স্থানে ঢোলটি নিজে নিজে বেজে উঠবে সে অঞ্চলটি তারই হবে। একইভাবে মধ্যম পৌত্রকে একটি জীবন্ত রাজা পাখি দিয়ে বলেন যে পাখিটি উড়ে গিয়ে যেখানে বসবে সে অঞ্চলের সত্ত্বাধিকারী সে-ই হবে। ক্রমান্বয়ে কনিষ্ঠ পৌত্রকে একটি তলোয়ার দিয়ে বলেন যে এই তলোয়ার নিয়ে যাওয়ার সময় যে অঞ্চলে গিয়ে তলোয়ারটি খাপ থেকে খসে পড়বে সে অঞ্চলের মালিক হবে সে। জনশ্রুতি মতে রাজার মধ্যম পৌত্রের বংশধর হল খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা। তাদের নিজস্ব দেশের নাম মুঙ্ জাঙ্ (মুঙ্-দেশ, জাঙ্-রাজাপাখি) এবং মুঙ্ জাঙ্ শব্দ থেকেই খাময়াং শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা আসামে অনুপ্রবেশ করার পূর্বে এখানে খাময়াং বলে কোনো টাই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। যদিও আসামে পদার্পণের পূর্বে বিভিন্ন দল বেঁধে টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা উত্তর ব্রহ্মদেশে শ্বান নামে পরিচিতি লাভ করে। ব্রহ্মদেশের রাজা আলমফ্রা এবং অন্যান্য বার্মা রাজার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাটকাই গিরিপথ অতিক্রম করে আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ঐতিহাসিক নিদর্শন মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে আহোম রাজা গৌরীনাথ সিংহের রাজত্বকালে যে

টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা পাটকাই গিরিপথ অতিক্রম করে আসামে অনুপ্রবেশ করে তাদেরকেই খাময়াং বলে অভিহিত করা হয়।

টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীয় লোকের মূল বাসস্থান : টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীয় লোকের মূল বাসস্থান সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে বৃহত্তর টাই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত টাই সম্প্রদায়ের লোকের আদি বাসস্থান হিসেবে দক্ষিণ পশ্চিম চীনকে অভিহিত করা হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রব্রজন করা টাই সম্প্রদায়ের লোকের আদি বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য দেখা যায়। পদ্মেশ্বর গগৈ হোবাংহো নদীর উপত্যকাকেই টাই জনগোষ্ঠীর আদি ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, *"The Tai were one of the latest and the most important of the historical races that had migrated from their original home-land probably in the Huwang-Ho Valley."*[১] অন্যদিকে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্চনের মতে টাই জনগোষ্ঠীয় লোকেদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, এবং পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে তারা ব্রহ্মদেশের উত্তর দিকে প্রব্রজন করে। তিনি জানান, *"South-Western China was the original home of the Tai people, or rather was the region where they attained to a marked separate development as a people. From there they migrated into upper Burma."*[২] ম্যাক্সমুলার মধ্য এশিয়াকেই টাই জনগোষ্ঠীর মূল গৃহভূমি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং সেখান থেকে তারা ক্রমান্বয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রব্রজন করে মেকং, মেনাম, ইরাবতী এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে।

টাই জনগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান নিয়ে পণ্ডিতমহল বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেও ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে আমরা মোটামুটিভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে চীন দেশ থেকে উত্তর ব্রহ্মদেশে প্রব্রজন করা টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বহু পূর্বে অন্যান্য স্থান থেকে প্রব্রজিত হয়ে চীনদেশে এসেছিল। কিন্তু কোথা থেকে প্রব্রজিত হয়ে তারা চীনদেশে পদার্পণ করেছিল তার তথ্য পাওয়া দুষ্কর। সুপ্রীতি ফুকনের মন্তব্যকে ধার করে বলতে পারি হাল আমলের নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন মতে মনুষ্য প্রজাতির জন্মের আদি বাসস্থানের মধ্যে মধ্যপূর্ব এশিয়াও অন্যতম। সম্ভবতঃ টাই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা মধ্যপূর্ব এশিয়া থেকে বর্তমানের মঙ্গোলীয় অঞ্চলে প্রব্রজিত হয়ে কালক্রমে চীন দেশের হোবাংহো উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে তারা চীনের মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস শুরু করে।

খ্রিস্টপূর্ব ২৪৫০-১০৫০ এর মধ্যে চীন দেশে ছাং বংশের রাজত্ব ছিল। সে সময় টাই জনগোষ্ঠীর একটি শাখা দক্ষিণ চীনে আসে এবং সেখানকার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে বসবাস করার সময়ে চীনা সম্রাটের অত্যাচারের ফলে টাই লোকেরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। পরবর্তী সময়ে টাই জনগোষ্ঠীর লোকেরা একত্রিত হয়ে নানচাও নামে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করে। নানচাও সাম্রাজ্যই বর্তমানের য়ুনান প্রদেশের বৃহৎ অংশ ম্যায়ানমার, থাইল্যেণ্ড, লাওচর অংশ বিশেষের উপরি তার পশ্চিম সীমা ভারতের মগধ রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। টাই সম্রাট কুলুফেঙে-র রাজত্বকালে নানচাও অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। চীনা সম্রাটের উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও কুলুফেঙে-র নানচাও সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানচাও সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণরূপে পতন ঘটে। এভাবে চীনা সম্রাটদের সঙ্গে টাই জনগোষ্ঠীয় লোকের সংঘর্ষের ফলস্বরূপ তারা কিছু ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মূল বাসভূমি ছেড়ে অন্যান্য অঞ্চলে প্রব্রজিত হতে বাধ্য হয়। ভীমকান্ত বরুয়ার মতে, *"ব্রহ্ম রাজা আলমফ্রা এবং তার পরবর্তী রাজা সকলে শাসনকালের সময়ে বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার চালানোর ফলে অষ্টাদশ শতকের*

শেষের দিকে কয়েকটি টাই জনগোষ্ঠী আসামে প্রবেশ করে এবং সেগুলি পরবর্তী সময়ে টাই খামতি, টাই ফাকে, টাই খাময়াং, টাই টুরুং, টাই আইতন ইত্যাদি স্থানীয় নামে পরিচিতি লাভ করে।”[৩]

টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীয় লোকের আসামে প্রব্রজন করার ইতিহাস : খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেদের আসামে প্রব্রজনের ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য কিছু টাই জনগোষ্ঠীর প্রব্রজনের সাদৃশ থাকলেও তা সম্পূর্ণ একই ধরণের বললে ভুল হবে। টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর আসামে পদার্পণের সম্পূর্ণ তথ্য জানতে হলে ‘খাময়াং বুরঞ্জী’ গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করতেই হবে। ‘ত্তাই খাময়াং বুরঞ্জী’-তে খাময়াং সকলের আসামে প্রব্রজনের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখিত আছে-মৌঙ্ মিট রাজ্যের রাজা ফুটাংখাঙের চ্যুজাতফা, চ্যুকানফা এবং চ্যুকাফা নামে তিন পুত্র ছিল। ফুটাংখাঙের মৃত্যুর পর যদিও কিছু সময়ের জন্য চ্যুজাতফা রাজা হন কিন্তু তার অকাল মৃত্যুর পর চ্যুকানফা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তৎসঙ্গে চ্যুকাফাকে যুবরাজ ঘোষণা করা হয়। চ্যুকানফা তিন হাজার পদাতিক এবং তিনশত অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে চ্যুকাফাকে চীনের হাত থেকে পূর্বে হারানো রাজ্যখণ্ড উদ্ধারের জন্য পাঠান। কিন্তু চ্যুকাফা চীনের সম্রাটের হাতে পরাজয় বরণ করে মধ্যরাতে রাজধানীর প্রধান দরজার সম্মুখে উপস্থিত হন যদিও সে সময় সিংহদ্বার বন্ধ থাকায় রাজ আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের কুটিল চক্রান্তে রাজা নিজের ভাইকে রাজধানীতে প্রবেশের অধিকার না দেওয়ার ফলে চ্যুকাফা গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে নিজে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে পাটকাই পর্বত অতিক্রম করে কামরূপ রাজ্যের সৌমারপীঠে প্রবেশ করে। সেখানে তিনি ইষ্টদেবতার নামে একটি মোরগ বলি দিয়ে রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করে স্বদেশে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য যে টাই ভাষাতে ‘পাট’ মানে কাটা বা বলি দেওয়া এবং ‘কাই’ মানে মোরগ। চ্যুকাফা যে স্থানে মোরগটি কেটে সীমা নির্ধারণ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই পর্বতকে পাটকাই নামে জানা যায়।

অন্যদিকে চ্যুকানফা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছোট ভাইয়ের সন্ধানে দলে দলে মানুষ পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু কোনো দলই চ্যুকাফার সন্ধান দিতে পারেনি। তখন চ্যুকানফা টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর নয়টি ‘ফৈদ’-এর (সম্প্রদায়ের) নয়জন বিষয়া যেমন- থাওমুং, চাওহাই, পাংয়ুক, চাউলু, চাউলিক, বাইলুং, তুনখাং, চাওচং এবং ফালেক ফৈদ-এর নেতৃত্বে একটি দল পাঠান। এই দলটি নানা ধরণের বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আনুমানিক ১২৩৬-১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে চ্যুকাফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজার অভীপ্সা অবগত করায়। চ্যুকাফা নিজ রাজ্যের শুভ সংবাদ সাদরে গ্রহণ করে। খাময়াং সকলে সেখানে ফিরে গিয়ে চ্যুকাফার কুশল বার্তা রাজাকে জানান এবং পরবর্তী সময়ে তারা পাটকাইর পাদদেশে অবস্থিত নঙ্ খেউ নঙ্ নকজাঙ্ নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং পরে তারা মান্ নাম মান্ নয় নামে দুটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলে প্রায় তিনশত বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত করার পর নানা বিপদের সম্মুখীন হয়ে তারা সে অঞ্চল ত্যাগ করে অরুণাচলের চাংলাং জেলার সীমান্তে উপস্থিত হয়ে সে অঞ্চলকে খামজাং নামে অভিহিত করে প্রায় একশত বৎসরকাল সেখানে অতিবাহিত করে। কিন্তু সেখানে চিংফৌ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতের ফলে খামজাং অঞ্চল ত্যাগ করে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে নামচুম (টেঙাপানী) এবং মৌং তেউলা (শদিয়া)-তে খামজাং জনগোষ্ঠীর লোকেরা আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে মান্ নাম্ অঞ্চলে থাকা টাই জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠসংখ্যক লোক মৌং তেউলা ত্যাগ করে আহোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রংপুরে এসে উপস্থিত হয়। আবার সে সময়ে আহোম রাজ্যে মোবামরীয়া বিদ্রোহের ফলস্বরূপ অনন্যোপায় হয়ে পুনরায় তারা মৌং তেউলা-তে ফিরে আসে। তখন বৃটিশ সরকার মোবামরীয়া বিদ্রোহ দমন করে গৌরীনাথ সিংহকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে ১৭৯৪ সনে বঙ্গদেশে চলে যায়, এবং সে সময়ে আহোম রাজ্যের রাজধানী যোরহাটে স্থানান্তরিত হয়। এই সুযোগে

মান্ নাম্ অঞ্চলে বসবাস করা টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা স্বর্গদেউ গৌরীনাথ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যোরহাট জেলার তিতাবরের ধলি নদীর সমীপে বসতি স্থাপন করে। মোবামরীয়া বিদ্রোহে ত্রস্ত হওয়া আহোমদের বিরুদ্ধে খাময়াং সকলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাদের সঙ্গে অন্যান্য কিছু জনগোষ্ঠীর লোকও এই বিদ্রোহে যোগদান করে। কিন্তু আহোম রাজা সে বিদ্রোহ দমন করে বিদ্রোহীদের যুদ্ধবন্দী করতে সক্ষম হন। তারপর ১৮২৬ সনে ইয়াণ্ডাবু সন্ধির ফলস্বরূপ আসামের শাসনভার ইংরেজ সরকারের অধীনে চলে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে খাময়াং, ফাকে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অধীনে থাকা অঞ্চল সমূহ ইংরেজ শাসনাধিষ্ঠিত অঞ্চলে যুক্ত হয়। কিন্তু খাময়াং সকলে নিজ রাজ্যখণ্ড উদ্ধারের প্রচেষ্ঠায় ১৮৩৯ সনে ইংরেজ কর্ণেল আদাম হোবাইটকে হত্যা করে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তারা ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ডিব্রুগড়ে এসে খনিকর নামক স্থানে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে বসতি স্থাপন করে। তারপর তারা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মার্ঘেরিটার পাবৈমুখ গাঁও-এ এসে বসবাস শুরু করে। অন্যদিকে তিতাবরের ধলি নদীর সমীপবর্তী অঞ্চলে বসবাস করা খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা বান্দরচলিয়া চা-বাগানের নিকটে বরগাঁও নামে নতুন গ্রাম পেতে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরুন তারা ১৯৩৬ সনে শিবসাগর জেলার দিচাংপানী, ১৯৬৮ সনে চলাপথার, ১৯১৯ সনে গোলাঘাট জেলার সরুপথারের ১নং রজাপুখুরীতে নিজস্ব গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে।

আসামের টাই খাময়াং বসতি প্রধান অঞ্চল : চীন-ম্যায়ানমার থেকে প্রব্রজিত হয়ে আসা টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা উনবিংশ শতাব্দীতে আসামের চারটি জেলা বিশেষ করে শিবসাগর, যোরহাট, গোলাঘাট এবং তিনিসুকীয়ার অন্তর্গত প্রায় দশটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। টাই খাময়াং বসতি প্রধান গ্রামের মধ্যে অন্যতম হল- শিবসাগর জেলার-চলাপথার শ্যাম গাঁও, রহন শ্যাম গাঁও, মণিটিং শ্যাম গাঁও, দিচাংপানী শ্যাম গাঁও, চলাবন গাঁও, যোরহাট জেলার- ন-শ্যাম গাঁও, বালিজান শ্যাম গাঁও, বেতবারী শ্যাম গাঁও, গোলাঘাট জেলার ১নং রজাপুখুরী শ্যাম গাঁও এবং তিনিসুকীয়া জেলার পাবৈমুখ গাঁও প্রভৃতি।

মার্ঘেরিটার পাবৈমুখ গাঁও-এর ইতিহাস এবং অবস্থান : ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের আমলে আসাম প্রদেশের অধীনে বর্তমানের ডিব্রুগড় ও তিনিসুকীয়া জেলা লক্ষীমপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের লক্ষীমপুর জেলা ১৯৭১ সালে দুটি জেলায় বিভক্ত হয়- উত্তর লক্ষীমপুর এবং ডিব্রুগড়। পরবর্তী সময়ে আসাম সরকার ১৯৭৩ সনের ২৬ জানুয়ারিতে ডিব্রুগড় জেলার মহকুমা হিসেবে 'তিনিসুকীয়া'-কে মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করে। পুনরায় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনিসুকীয়া মহকুমাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং মহকুমা হিসেবে -তিনিসুকীয়া, শদিয়া ও মার্ঘেরিটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আসামে ইংরেজ শাসনকাল শুরু হওয়ার পূর্বে মার্ঘেরিটা শহরের নাম ছিল 'মাকুম'। মার্ঘেরিটা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আসাম মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাপক বেবী হোবাইট উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশ দশকে উজান আসামের সিভিল সার্জন হিসেবে নিয়োজিত হন। উল্লেখ্য যে ডিগবৈ থেকে অরুণাচলের সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বৃটিশ জমিদারি সুদৃঢ় করতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জনশ্রুতি মতে বৃটিশ জমিদার বিষয়ার কন্যা মার্ঘারেট-এর মাকুম অঞ্চলে দুর্ঘটনায় করুণ মৃত্যু ঘটে। মার্ঘারেট-এর স্মৃতিতে মাকুমের নাম মার্ঘেরিটা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে ১৮৮৪ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে বুঢ়ীদিহিং নদীর উপর নির্মিত সেতুতে প্রথম রেল চলাচল আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৮৯৮ সালে বানাগ্রস্ত সেতুতে অচলাবস্থা দেখা দেয়। সে সময়ে সি আর পেগানিনি-র নেতৃত্বে কাঠের সেতুর পরিবর্তে লোহার সেতু নির্মাণ করা হয়। চি আর পেগানিনি ছিলেন ইতালীর নাগরিক। তার কর্মদক্ষতার জন্য ইতালীর রানী মার্ঘারেটের প্রতি সম্মান

জানিয়ে এই অঞ্চলের নাম মাকুমের পরিবর্তে 'মার্ঘেরিটা' রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আসাম পর্যবেক্ষণ করতে আসা বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন রানী মার্ঘারেটকে সম্মান জানিয়ে মার্ঘেরিটা নামকে অনুমোদন জানান। রেলপথ এবং স্থলপথে মার্ঘেরিটা মহকুমার সংলগ্ন অঞ্চল সমূহের মধ্যে- শদিয়া, ডিব্রুগড়, তিনিসুকীয়া, ডিগবৈ, লিডু, বরগোলাই, পেঙেরী, জাগুন, লেখাপানী, বরডুমচা পাবৈ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে ৩৮নং রাষ্ট্রীয় রাজপথ নির্মাণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখাপানী থেকে ঐতিহাসিক 'ষ্টিলবেল' পথের যাত্রারম্ভ করা হয় যদিও মেরামতের অভাবে তা এখন বন্ধ হয়ে আছে।

মার্ঘেরিটা মহকুমাতে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাগম ঘটেছে। এই মহকুমায় প্রব্রজন হওয়া প্রাচীন অধিবাসী সমূহের মধ্যে অন্যতম হল- দেউরী, চুতীয়া, মরান, মটক, কছারী প্রভৃতি। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে চ্যুকাফার দলের প্রব্রজন হয় মার্ঘেরিটা মহকুমাতে। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে প্রব্রজন ঘটে চিংফৌ, টাই খামতি, টাই খাময়াং, টাই ফাকিয়াল, মান টাই আদি জনগোষ্ঠীয় লোকের। মার্ঘেরিটা মহকুমার সীমান্তবর্তী অরুণাচল, নগাপাহারের সংলগ্ন সমতল অঞ্চলে টাংচা, চেমা-নগা, চাকমা, নংক্তে আদি জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল এবং বর্তমান সময়েও মার্ঘেরিটা মহকুমায় টাংচা, নগা, চাকমা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীয় লোকের বহু গ্রাম পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজ সরকারের আমলে মার্ঘেরিটা মহকুমায় অনেক বর্ণহিন্দু লোকের আগমন ঘটেছিল। আর্থিক উন্নতিসাধন প্রকল্পে মার্ঘেরিটা মহকুমায় যেসব চা উদ্যোগ, তেল উদ্যোগ, কয়লা উদ্যোগ স্থাপিত হয়েছিল তার জন্য বিভিন্ন ধরণের দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন হয়েছিল, সে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মচারীর প্রব্রজন ঘটেছিল। তারমধ্যে অন্যতম হল-উড়িষ্যার চা-জনজাতির লোক, অন্ধ্রের তেলেঙ্গা লোক, বাঙালি লোক, হিন্দীভাষী লোক ও নেপালীভাষী লোক বিভিন্ন সময়ে মার্ঘেরিটা মহকুমায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

পাবৈমুখ গাঁওটি মার্ঘেরিটা মহকুমার মাকুম মৌজার অন্তর্ভুক্ত। মার্ঘেরিটা শহরের ৩৮নং রাষ্ট্রীয় রাজপথ থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরত্বে বুঢ়ীদিহিং নদীর উত্তর পারে পাবৈমুখ গাঁওটি অবস্থিত। তার উত্তরদিকে জংলুকুরুকা কছারী গাঁও, পশ্চিমদিকে মিরিকা মাজুলী কৈবর্ত গাঁও, দক্ষিণদিকে বুঢ়ীদিহিং নদী এবং মাঝি গাঁও, পূর্বদিকে আছে খোলা প্রান্তর, এই প্রান্তর অতিক্রম করলে দেখা যায় নেপালী সম্প্রদায়ের লামা গাঁও। মিরিকা মাজুলী কৈবর্ত গাঁও-কে ঘেষে রয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল যা অরুণাচল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে।

পাবৈমুখ গাঁওটির নামকরণ নিয়ে কোনো লিখিত নিদর্শন বা ঐতিহাসিক প্রমান নেই। কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে এই অঞ্চলে একটি ছোট নদী আছে যা পাবৈমুখ চা-বাগান থেকে প্রবাহিত হয়ে ডিগবৈ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যদিয়ে মার্ঘেরিটার দিহিং নদী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। পাবৈমুখ গাঁওটি নদীর একেবারে মুখ অংশকে আগলে আছে বলে হয়তো সেই গ্রামের নাম পাবৈমুখ হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। অন্যদিকে টাইখাময়াং ভাষাতে পাবৈ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-'পা' মানে 'মাছ' এবং 'বৈ' মানে 'ঠাই' বা 'অঞ্চল'। অর্থাৎ যে অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় সে অঞ্চলকে পাবৈমুখ বলে অভিহিত করা হয়।

টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীয় লোকের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় পরিচয় : টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা মূলত মঙ্গোলীয় প্রজাতির লোক। তাদের শরীরের বর্ণ প্রধানত গৌর, হলুদ ও ঈষৎ রক্ত বর্ণের হয়। মুখের আকৃতি চেপটা, চোয়াল বড়, নাক মোটা ও গোল, চক্ষু সমান্তরাল ও ধারালো দৃষ্টির হয়ে থাকে। টাই খাময়াং লোকেরা শারীরিকভাবে অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

টাই খাময়াং জনসমাজে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি হলেন পিতৃ। ঘরের প্রত্যেকজন ব্যক্তি তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে চলে। সম্পত্তি বেচা-কেনা, সন্তানের শিক্ষা গ্রহণ, বৈবাহিক সম্বন্ধ ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিবারের মুরব্বী ব্যক্তি গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে সন্তানের লালন পালন, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা, রান্নাবান্না, বস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যে স্বামীকে সাহায্য করে টাই খাময়াং সমাজে নারীরা স্বাবলম্বী জীবন যাপন করে।
টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীয় লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের ধর্মীয় জীবন বৌদ্ধবিহারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পূর্বে কাঠ, বাঁশ ও টকৌপাতের সাহায্যে চাংঘরের আদলে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হত, কিন্তু সম্প্রতি বৌদ্ধধর্মীয় লোকেরা ইট, পাথর, রড ও সিমেন্ট দিয়ে নিজ নিজ গ্রামে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করে। বৌদ্ধবিহারের ভিতরে প্রার্থনা গৃহে বুদ্ধদেবের মূর্তিকে স্থাপন করা হয়। প্রার্থনা গৃহে একটি বৃহৎ কাঠের আসন নির্মাণ করে তার মধ্যে মূল্যবান ধাতু দিয়ে গড়ে মূর্তি স্থাপন করা হয়, এসব মূর্তি স্থানীয় অথবা পৃথিবীর অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধবিহারে 'বুদ্ধ' মূর্তি দান করারও একটি উৎসব টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীয় সমাজে প্রচলিত আছে। এই উৎসবের দিনকে 'পয়-লু-ফ্রা' বলা হয়। মন্দিরের ভিতরের প্রার্থনা কক্ষের দেয়ালে বুদ্ধদেবের জীবনকালের বিবিধ অবস্থার ছবি এবং বুদ্ধ পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়।

উপসংহার : প্রব্রজনের এক দীর্ঘ পরিক্রমার অন্তে আসামে বসবাস করে থাকা টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখনও যথা সম্ভব নিজস্ব ঐতিহ্য এবং পরম্পরা রক্ষা করে চলে, যদিও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজজীবনে নানা ধরণের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সুসংঘবদ্ধভাবে সামাজিক রীতি নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া টাই খাময়াং সকলে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয় এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মার্ঘেরিটার পাবৈমুখ গাঁও-এর টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বললেও আসামের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করা টাই খাময়াং লোকেরা অসমীয়াকে নিজের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ের মাধ্যমেই একটি জাতি বিকশিত হয়, আর এই বৈশিষ্ট্য খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে এ কথা বলতেই হয় যে টাই খাময়াং জনগোষ্ঠীর লোকেরা বৃহত্তর অসমীয়া জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সূত্র নির্দেশ:

১। Gogoi, Podmeswar : 'The Tai and The Tai Kingdoms', G.U., 1968, P.32।
২। Grierson, G.A. : 'Linguistic Survey of India, Vol II, P.59।
৩। বরুয়া, ভীমকান্ত : 'অসমর ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, স্টুডেন্ট এম্পরিয়াম, ডিব্রুগড়, পৃ.২৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। নিংখী, রাজীব : 'চিংফৌ সমাজ আরু সভ্যতা', প্রথম প্রকাশ; নবেম্বর, ২০০৮, লিডু সাহিত্য সভা, লিডু ।
২। ভট্টাচার্য, শ্রী প্রমোদচন্দ্র (সম্পাদিত): 'অসমর জনজাতি', প্রথম প্রকাশ; ১৯৬২, অসম সাহিত্য সভা, লয়ারস বুকস্টল, পাণবাজার, গৌহাটি ।

৩। দত্ত, দিব্যলতা : 'বর্ণাঢ্য জনগোষ্ঠী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি', প্রথম প্রকাশ; সেপ্টেম্বর, ২০১৫, কথা রিডার্স ফরাম, গৌহাটি ।

৪। শইকিয়া, রুণজুন : 'চিংফৌ আরু টাইফাকে সংস্কৃতি' প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, উত্তরপূব ভারত লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, নগাঁও-১ ।